চা শ্রমিকের সুরক্ষা: চ্যালেঞ্জ ও জবাবদিহিতা

ফিলিপ গাইন

বণিক বার্তা, মে ২১ ২০২১

২১ মে ২০২১। আন্তর্জাতিক চা দিবস। মূলত চা উৎপাদনকারী দেশগুলো দিবসটি পালন করে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা দিবসটি পালনে মুখ্য ভূমিকায় থাকে। দিবসটি ঘিরে চায়ের টেকসই উৎপাদন ও সেবন নিয়ে যেমন প্রচার-প্রচারণা হয়, তেমনি ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূর করতে চায়ের ভূমিকার ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়।

বাংলাদেশের সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ১৫৮টি চা বাগানে (পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁওয়ের আটটি বাগান বাদে) যে ১ লাখ ৩৮ হাজার ৩৬৭ জন শ্রমিক কাজ করেন, তারা কেমন আছেন? আন্তর্জাতিক চা দিবসে এমন প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। কারণ এসব শ্রমিক ও তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ যে সীমাহীন দারিদ্র্য ও বঞ্চনার মধ্যে ডুবে আছে তার আলামত সুস্পষ্ট।

চা শ্রমিকরা যে বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার, তার বড় আলামত মেলে তাদের অত্যন্ত কম মজুরি থেকে। একজন চা শ্রমিকের দৈনিক নগদ মজুরি ১২০ টাকা (মালিক-শ্রমিকের সর্বশেষ চুক্তি অনুযায়ী যা ২০১৯-২০২০ সালের জন্য কার্যকর)। দৈনিক নগদ মজুরির সঙ্গে একজন শ্রমিক আরো যা পান, তার মধ্যে অন্যতম সাত-আট কেজি চাল বা আটা (সাড়ে তিন কেজি নিজের জন্য এবং বাকিটুকু স্বামী/স্ত্রী ও ১২ বছরের কম বয়সী সন্তানদের জন্য)। ভর্তুকি মূল্যে প্রতি কেজি চাল বা আটার জন্য তাকে ২ টাকা ব্যয় করতে হয়। স্থায়ী বা নিবন্ধিত শ্রমিক হলে প্রতি বছর ৪৭ দিনের মজুরির সমান উৎসব ভাতা পান, যা দুটি প্রধান উৎসবে দেয়া হয়। তার বসবাস লেবার লাইন বা শ্রমিক কলোনিতে এবং সেখানে তাকে ঘরভাড়া দিতে হয় না। এসবের পাশাপাশি তিনি আরো পান বিনা মূল্যে ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবা।

নগদ মজুরি ও অন্যান্য সুবিধা মিলিয়ে একজন শ্রমিকের বর্তমান দৈনিক আয় সর্বোচ্চ ২০০ টাকা বা মাসিক আয় ৬ হাজার টাকার বেশি নয়, এমন হিসাব দেন বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন নেতাদের অনেকে। কিন্তু বাগান মালিকপক্ষ চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ও শ্রমিককে দেয়া সুবিধার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করে। তাদের হিসাবে 'একজন চা-শ্রমিকের দৈনিক মজুরি দাঁড়ায় ২৭০ টাকা,' বলেছেন বাংলাদেশ টি অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএ) একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তবে জানা গেছে ২০১৯ সালে চা শ্রমিকদের জন্য গঠিত নিম্নতম মজুরি বোর্ডে একজন চা শ্রমিক দৈনিক সাকল্যে কী পান, তার একটি হিসাব দিয়েছে চা বাগান মালিকদের সংগঠন বিটিএ। এ হিসাব অনুসারে মাঠ পর্যায়ে যারা কাজ করেন, তারা পান ৩৭৮ দশমিক ৯১ টাকা এবং যারা কারখানায় কাজ করেন, তারা পান ৩৪৬ দশমিক ৯১ টাকা। এ হিসাব সর্বশেষ ২০১৯-২০-এর জন্য কার্যকর চুক্তি সইয়ের আগে যখন নগদ মজুরি ছিল ১০২ টাকা। অর্থাৎ এর সঙ্গে যোগ হবে আরো ১৮ টাকা। মালিকদের এ হিসাব শ্রমিকদের কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।

যে বিষয়টি দিবালোকের মতো স্পষ্ট, তা হলো মজুরি বৈষম্যসহ বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনার কারণে চা জনগোষ্ঠীর মানুষ অন্যান্য নাগরিকদের চেয়ে অনেক পেছনে পড়ে আছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও ইউনিসেফের ২০১৮ সালের এক জরিপের ফলাফল অনুসারে, চা বাগানের ৭৪ শতাংশ পরিবার দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। অথচ ২০১৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্যের হার ছিল ২৪ শতাংশ।

এমন অবস্থায় ধারণা করা হয় চা উৎপাদনকারী দেশগুলোয় বাংলাদেশের চা শ্রমিকরা সবচেয়ে কম মজুরি পান। তাদের গড় পারিবারিক আয় বাংলাদেশের জাতীয় বা গ্রামীণ দারিদ্র্যসীমা ও পারিবারিক আয়ের চেয়ে অনেক কম। আমাদের প্রতিবেশী দুই দেশ শ্রীলংকা ও ভারতে একজন চা শ্রমিকের দৈনিক নগদ মজুরি যথাক্রমে ৫ ও ২ মার্কিন ডলারের বেশি। এর ওপর যোগ হয় আবাসন, শিশুযত্ন এবং বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য বাধ্যতামূলক ভাতা,

যেমন উপস্থিতি ভাতা ও বোনাস এবং 'ওভার কিলো পেমেন্ট' (দিনের কোটা পূরণের পরে কাঁচা পাতা তোলার জন্য প্রদত্ত মজুরি)।

২০১৫ সালে শ্রীলংকার এক কেজি চা যখন ২ দশমিক ৯৯ ডলারে বিক্রি হয়, বিশ্ববাজারে তখন চায়ের দাম কেজিপ্রতি ২ দশমিক ৫৯ ডলার এবং চট্টগ্রামে নিলামে তখন চায়ের দাম কেজি ২ দশমিক ৪১ ডলার। শ্রীলংকার চা বিশ্ববাজারে সর্বাধিক দাম পাচ্ছে বটে, তার পরও বাংলাদেশের চায়ের গড় নিলাম মূল্য এত কম নয় যে এখানকার চা শ্রমিকদের দৈনিক নগদ মজুরি এমন কম হবে। শ্রীলংকায় চা উৎপাদন ব্যয়ের ৬৩ শতাংশ খরচ হয় শ্রমিকের জন্য ও ৪ শতাংশ যায় কর্মচারী ও ব্যবস্থাপনার খরচ মেটাতে। বাংলাদেশে চা শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণের সময় দেখা উচিত তাদের মজুরি উৎপাদন খরচের কত শতাংশ।

'বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬' একদিকে যেমন চা শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক, তেমনি এ আইনের অনেক ধারার লঙ্ঘন সুস্পষ্ট। শ্রম আইন কোনো প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের ক্ষেত্রে কেবল জাতীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন করার অধিকার দিয়েছে। সব চা বাগান মিলে একটি প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ হিসেবে পরিগণিত। কাজেই চা শ্রমিকরা কেবল জাতীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন করতে পারেন এবং একটি ইউনিয়ন করার জন্য মোট শ্রমিকের অন্তত ২০ শতাংশকে সদস্য হতে হবে। মালিক ও সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণে ইউনিয়ন করার জটিলতা এমনই যে চা শিল্পে দ্বিতীয় কোনো ইউনিয়ন করা আপাতত একেবারেই অসম্ভব এবং এর কুফল সহজেই অনুমেয়।

অন্যান্য শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের ১০ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি থাকলেও চা শ্রমিকরা এ ছুটি পান না। অন্যান্য শিল্পে কর্মরত শ্রমিকরা যেখানে ১৮ দিন কাজ করে একদিনের অর্জিত ছুটি পান, সেখানে চা শ্রমিকরা একদিনের ছুটি পান ২২ দিন কাজ করে।

শ্রম আইনে বলা আছে, 'কোনো মালিক নিয়োগপত্র প্রদান না করিয়া কোনো শ্রমিককে নিয়োগ করিতে পারিবেন না এবং নিয়োজিত প্রত্যেক শ্রমিককে ছবিসহ পরিচয়পত্র প্রদান করিতে হইবে।' কিন্তু চা বাগানের অনেক শ্রমিক মালিকপক্ষের কাছ থেকে শ্রম আইন অনুসারে নিয়োগপত্র পান না বলে অভিযোগ আছে।

এমন বহু অভিযোগ রয়েছে যে কোনো শ্রমিককে স্থায়ী করার আগে কয়েক বছর অস্থায়ী হিসেবে কাজ করানো হয়। অস্থায়ী হিসেবে কাজ করা শ্রমিকরা সাধারণত পুরো রেশন, চিকিৎসাসেবা ও মজুরিসহ ছুটি পান না।

২০০৬ সালের শ্রম আইন (অনুচ্ছেদ ২৩৪) অনুযায়ী, কোম্পানির মুনাফার ৫ শতাংশ শ্রমিকদের পাওয়ার কথা। মুনাফার এই অর্থ শ্রমিকদের অংশগ্রহণমূলক তহবিল ও শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে জমা দেয়ার কথা, যা তারা সম্মিলিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারবেন। বর্তমান শ্রম আইন প্রণয়নের আগেও চা বাগানে এ বিধান ছিল। তবে চা শ্রমিকরা অতীতেও এই লভ্যাংশ পাওয়া থেকে বঞ্চিত ছিলেন, এখনো আছেন।

শ্রম আইন ও ২০১৫ সালের বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী, শ্রমিকদের আরো কিছু উলে-খযোগ্য সুবিধা দেয়ার কথা থাকলেও সেগুলো থেকে তারা বঞ্চিতই থাকছেন। যেমন কর্মস্থলে টয়লেট ও প্রক্ষালন সুবিধা। যেখানে চা শ্রমিকরা চা পাতা তোলার কাজ করেন এবং যেখানে চা পাতা তোলা শ্রমিকদের ৯০ শতাংশের বেশি নারী, সেখানে না আছে টয়লেট, না আছে প্রক্ষালন কক্ষ। তাছাড়া খাবার পানির সরবরাহও সবসময় পর্যাপ্ত থাকে না, এমন অভিযোগও আছে।

যদি বাগান মালিকরা শ্রম বিধিমালা (অনুচ্ছেদ ৭৯) যথাযথভাবে অনুসরণ করেন, তাহলে বাগানের ৫০০ বা তার অধিক শ্রমিকদের জন্য একজন কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়ার কথা। যদি শ্রমিকের সংখ্যা দুই হাজারের বেশি হয়, তাহলে প্রত্যেক দুই হাজার শ্রমিকের জন্য একজন অতিরিক্ত কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়ার কথা। এসব কল্যাণ কর্মকর্তা বাগানের মালিক ও শ্রমিক, উভয়ের কল্যাণে কাজ করবেন।

চা শ্রমিকদের জন্য একটি বড় উদ্বেগের বিষয় হলো, তারা কোনো গ্র্যাচুইটি পান না। একজন চা শ্রমিক ৪০ বছর বা তারও বেশি সময় চা বাগানে কাজ করে গেলেন, অথচ কর্মজীবনের শেষে কোনো গ্র্যাচুইটি পেলেন না। তবে তারা কিছু পেনশন পান, যা বর্তমানে সপ্তাহে ১৫০ টাকা (২০০৮ সালে ছিল ২০ টাকা)। সংগত কারণে তারা এতে খুশি নন। তারা গ্র্যাচুইটি চান। বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন ও মালিকদের সংগঠন বাংলাদশ চা সংসদ (বিটিএ) ২০১৭ ও ২০১৮ সালের জন্য যে চুক্তি করেছিল, তাতে গ্র্যাচুইটি দিতে বিটিএ সম্মত হয়েছিল। কিন্তু অবসরে যাওয়া কোনো শ্রমিকই

এখনো কোনো গ্র্যাচুইটি পাননি। আর ২০১৯-২০ সালের জন্য কার্যকর চুক্তিতে গ্র্যাচুইটির ব্যাপারে বলা হয়েছে, 'গ্র্যাচুইটি: বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬/২০১৩ অনুসারে হইবে।'

এমন কী ঘটল যে মালিকরা গ্র্যাচুইটি দেয়ার ব্যাপারে মত পাল্টালেন। শ্রমিকদের ইউনিয়ন গ্র্যাচুইটির জন্য অনেক চেষ্টা করেও মালিকদের সরাসরি অঙ্গীকার আদায় করতে পারেনি। এর অর্থ হচ্ছে মালিকরা অতীতে যেমন গ্র্যাচুইটি দেননি, তেমনি এখনো দেবেন না।

চা শ্রমিকের আবাসন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-এসবই যেন দুর্ভাগ্যের আয়না। তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব বাগান মালিকের। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর পঞ্চম তফশিলে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেয়া আছে। শুধু তাই নয়, ঘর মেরামতের দায়িত্বও বাগান মালিকের। শ্রম বিধিমালার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা [৭ (১) খ] অনুসারে, প্রতি বছর লেবার লাইনে বসবাসকারী শতকরা অন্ড়ত ১০ ভাগ শ্রমিকের জন্য 'মির্তিঙ্গা টাইপ' (পাকা দেয়ালের) গৃহ নির্মাণ করতে হবে। গৃহের মেরামত, ব্যবহার ও দেখাশোনার জন্য মালিক-শ্রমিক উভয়ের দায়িত্ব শ্রম বিধিমালায় দেয়া আছে। চা শ্রমিকরা বাগান মালিকের দেয়া গৃহের ব্যাপারে সন্তুষ্ট নন। প্রথমত, বাগান মালিকরা যদি প্রতি বছর ১০ শতাংশ হারে ঘর 'মির্তিঙ্গা টাইপ' করে দিতেন, তবে চা বাগানের লেবার লাইন বা শ্রমিক কলোনিতে এখন আর কোনো কাঁচা ঘর থাকত না। বাংলাদেশ টি বোর্ডের ২০১৯ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে, চা বাগানে পাকা ঘরের (মির্তিঙ্গা টাইপ) সংখ্যা ১৮ হাজার ৪৯০ আর কাঁচা ঘরের সংখ্যা ৫৭ হাজার ৫৯। এ অবস্থা আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। গৃহ নিয়ে আরো নানা উদ্বেগ আছে, শ্রম আইন যেসবের মীমাংসা হওয়া দরকার।

পাতাতোলা শ্রমিকদেরই করতে হয় চা শিল্পের সবচেয়ে কষ্টের কাজ। বিশেষ করে গর্ভবতী নারীদের নিদারুণ কষ্টের মধ্যে গর্ভের সময় পার করতে হয়। তাদের অধিকাংশ সন্তান প্রসবের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত ভারী ও কষ্টের কাজ করেন। ফলে অনেকের গর্ভপাত ঘটে এবং অনেকে মৃত সন্তান জন্ম দেন। তাছাড়া অধিকাংশ নারী বাড়িতেই মাটির ওপর করা বিছানায় অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে সন্তান প্রসব করেন। ফলে মা ও শিশু উভয়ই ঝুঁকির মধ্যে থাকে।

চা বাগানগুলোয় বাগান ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি আছে। কিন্তু এসব হাসপাতালে যে চিকিৎসা পাওয়া যায়, তাতে শ্রমিকরা সন্তুষ্ট নন। ক্যান্সার, যক্ষ্মাসহ বড় কোনো রোগে পড়লে বাগানের হাসপাতাল ও ডিসপেনসারিতে ভালো চিকিৎসা মেলে না। শ্রম আইন ও বিধিমালায় যেসব প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা চা শ্রমিক ও তাদের পরিবারের পাওয়ার কথা, তার অনেক কিছুই তারা পান না। তবে চা বাগানের কাছাকাছি যেসব সরকারি স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে চা শ্রমিকদের যেতে বাধা নেই। তাদের কেউ কেউ সেখানে যাচ্ছেনও; সংগত কারণেই তাদের সংখ্যা কম।

চা শ্রমিকের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চা বাগান মালিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যে শিক্ষার ব্যাপারে সবসময় উদাসীন থেকেছে, তার সপক্ষে জোরালো সব লক্ষণ আমরা দেখতে পাই। চা বাগানগুলোয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় খুবই কম।

চা শ্রমিকদের ঠিকানা বাগানের মধ্যে স্থাপিত লেবার লাইন বা শ্রমিক কলোনি। চা বাগানগুলোয় ধানী জমি আছে ২৮ হাজার ২৭৫ দশমিক শূন্য ৫ একর। জঙ্গল কেটে যে সময় থেকে চা শ্রমিকরা চা বাগান তৈরি করেছেন, সে সময় থেকেই এ ধানী জমিও তৈরি করে তারা চাষাবাদ করছেন। কিন্তু তারা লেবার লাইনের জমি, ঘর এবং ধানী বা ফসলি জমি কোনো কিছুরই মালিক নন। এসব জমির মালিক সরকার। সরকার চাইলে চা বাগানের যেকোনো জমি যেকোনো সময় নিয়ে নিতে পারে। তবে চা শ্রমিকরা যে জমি চাষ করেন, তা কেড়ে নিতে গেলে তারা তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং রাষ্ট্র ও বাগান মালিককে বুঝিয়ে দেন যে এ জমি তারা তৈরি করেছেন, যা দেড় শতাধিক বছর তাদের দখলে আছে। কাজেই এ জমির ওপর তাদের অধিকার জন্মেছে। চাইলেই এ জমি কেড়ে নেয়া যাবে না।

চা শ্রমিকরা ১৫০ বছরের অধিককাল বা পাঁচ প্রজন্ম ধরে যে জমিতে বসবাস ও চাষাবাদ করছেন, সে জমিতে মালিকানাস্বত্ব কি তারা কোনো দিন পাবেন না? এ প্রশ্ন চা বাগানের সর্বত্র শোনা যায়। ভূমির মালিকানা একটি গুরুতর বিষয়। এ নিয়ে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও করণীয় কী? সবাই জানতে আগ্রহী।

বাংলাদেশের চা শ্রমিক ও তাদের পরিবার-পরিজন শুধু দরিদ্র এবং পশ্চাত্পদই নয়। বিভিন্ন ভাষা, জাতি-পরিচয়, ধর্ম, সংস্কৃতি ও একটি বিশেষ পেশা অবলম্বন করে বেঁচে থাকা মানুষ এরা। এরা সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন ও পেছনে পড়ে আছে। তাদের জীবনমান উন্নয়নে সমান সুযোগ-সুবিধাই যথেষ্ট নয়; দরকার আরো বেশি কিছু। কাজেই চা শ্রমিকদের

প্রতি সুবিচার করতে হলে প্রথমেই শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালা তাকে যেসব অধিকার দেয়, সেসব নিশ্চিত করতে হবে। এরপর সামাজিক নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্র তাদের জন্য যে বরাদ্দ রেখেছে, তা আরো বাড়াতে হবে। ভূমির মালিকানা বঞ্চিত চা বাগানে 'বাঁধা' পড়া এসব মানুষের জন্য আরো অনেক কিছু করার আছে তাদের নিয়োগদাতা, রাষ্ট্র এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা এবং বৈচিত্র্যময় জাতি-পরিচয় বাঁচিয়ে রাখতে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যা যা করা সম্ভব, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে সেসব ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেয়া দরকার। সামাজিক ন্যায়বিচার ও রাজনৈতিক সুরক্ষাই পেছনে পড়ে থাকা চা শ্রমিক ও তাদের পরিবার-পরিজনকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে।

ফিলিপ গাইন: পরিচালক, সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)